ইউনিট ৬

ভাবসম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়া শেষে আপনি–

- কোনো বাক্য বা বাক্যগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ভাবকে সম্প্রসারিত করতে পারবেন।
- দৃষ্টান্ত ও যুক্তির মাধ্যমে কোনো গূঢ় ভাবকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কোনো চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।
- সহজ-সরল ভাষায় চিন্তা প্রকাশের কৌশল লিখতে পারবেন।
- চিন্তাকে কীভাবে একটি কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয়, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

কবি সাহিত্যিকরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখেন, তখন কখনো কখনো কোনো কোনো জায়গায় অল্প শব্দে কোনো একটি গুতর ভাব জমাট বেঁধে যায়। সাহিত্যিকের বলার কথাটি কোথাও কোথাও সংহত হয়ে প্রকাশিত হয়। সচেতন পাঠক পড়তে গেলে সাধারণত এই ধরনের বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে এসে থমকে দাঁড়ান; চমৎকৃত হন। হাতে কলম থাকলে এই জমাট বাধা, সংহত, অল্প জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশিত হওয়া বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে দাগ দিয়ে রাখেন। এসব চরণ বা চরণগুচ্ছ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনে উদ্ধৃতি হিসেবেও ব্যবহার করে থাকেন। বড় বড় সাহিত্যিকের এধরনের অনেক চরণ বা চরণগুচ্ছ অনেক সময় বহুল ব্যবহৃত হতে হতে প্রবাদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এই ধরনের চরণ বা চরণগুচ্ছই ভাবসম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' অথবা 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'।

ভাবসম্প্রসারণের জটিলতা কোথায়?

একটি গভীর জটিল গুরুত্বপূর্ণ কথা যখন কবি-সাহিত্যিকরা বলে ফেলেন, তখন তাদের এই বলাকে সংক্ষিপ্ত-সংহত করতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অলংকার ক্রিয়াশীল থাকে। এই অলংকারের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় উপমা এবং রূপক অলংকার। অর্থাৎ একটি বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের বা বস্তুর তুলনা করে কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের বক্তব্যকে স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। যেমন, 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে/দুঃখ বিনে সুখ লাভ হয় কি মহীতে।' এখানে কবি সুখকে কমল আর দুঃখকে কাঁটার সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু অনেকের জন্যে এই উপমাটিই জটিলতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে অনেক সময় আপাতজটিল শব্দের সমাবেশ থাকতে পারে। এটিও অনেক সময় শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছের অর্থ বুঝতে ব্যর্থ করে দেয়। এ-দুটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকলে ভাবসম্প্রসারণ করা সহজ হয়ে যায়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হয়–

ক. প্রথমে প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ ভালো করে একাধিকবার পড়তে হবে। মূল ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

খ. প্রদত্ত গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের জটিল শব্দগুলোর অর্থ আলাদাভাবে বুঝতে হবে।

গ. প্রদত্ত চরণ বা চরণগুচ্ছে কোনো তুলনা থাকলে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, কাকে কেন, কার সঙ্গে তুলনা করেছে।

ঘ. ভাবসম্প্রসারণের তিনটি অংশ থাকবে। প্রথমে মূলভাব, পরে সম্প্রসারিত ভাব এবং সবশেষে মন্তব্য বা উপসংহার।

ঙ. মূলভাব অংশে দুই থেকে চার বাক্যে সংক্ষেপে লিখতে হবে; প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ দিয়ে কবি বা সাহিত্যিক জীবন-জগৎ বা কোনো বিষয় সম্পর্কে কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেই কথাটি। এরপর সম্প্রসারিতভাব অংশে প্রথমে প্রদত্ত বাক্য বা

বাক্যগুচ্ছের জটিল শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করা যেতে পারে। এরপর কোনো উপমা-তুলনা বা অলংকার থাকলে সেটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। কাকে, কার সঙ্গে, কেন তুলনা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। এরপর নিজে থেকে আরো বাস্তব জীবনের উদাহরণ, উপমা-তুলনা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে যা ঘনীভূত হয়ে আছে তাকে স্পষ্ট করতে হবে। প্রয়োজনে মহৎ, ঐতিহাসিক মানুষদের ঘটনা সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। সবশেষে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য দিয়ে ভাব-সম্প্রসারণের উপসংহার টানা যেতে পারে।

চ. তবে খেয়াল রাখতে হবে, ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা যেন তুলনামূলকভাবে সহজ সরল হয়। একই কথার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যাবে, তবে তা যেন বেশি বড় না হয়। ছোট, সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ব্যবহারই শ্রেয়।

ছ. ভাব-সম্প্রসারণের আকার-আকৃতি কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে এর জন্যে বরাদ্দকৃত নম্বরের ওপর। আর অনুচ্ছেদ (para) সংখ্যা অন্তত তিনটি হবে। প্রয়োজনে বেশি অনুচ্ছেদ হতে পারে। তবে তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো।

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করে শির,
লিখে রেখো একফোঁটা দিলেম শিশির।

ক্ষুদ্রদানের আস্ফালন ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক। অন্যের জন্য কিছু করে তার উল্লেখ করা বা তা নিয়ে বড়াই করা মহৎ হৃদয়ের লক্ষণ নয়। এটি ক্ষুদ্রতা, দীনতারই পরিচায়ক। মহৎ হৃদয় নীরবে শুধু দিয়েই যায়।

শৈবালের জন্ম দিঘির বুকে। শৈবাল বেঁচেও থাকে দিঘির জলে। দিঘির জল ছাড়া শৈবালের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু শৈবাল থেকে কখনো কখনো রাতে সামান্য শিশির গড়িয়ে পড়ে দিঘির বুকে। এই সামান্য জল দিঘির জলের স্ফিতিতে কোন রকম প্রভাব ফেলে না। শৈবাল থেকে গড়িয়ে পড়া জল দিঘির অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না বললেই চলে। কিন্তু শৈবাল ঐ এক ফোঁটা জলকণা দিঘিকে প্রদান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ ঐ দিঘির জলের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে সামান্য শৈবাল। কিন্তু দিঘি কখনো তার বুকে আশ্রয় নেওয়া শৈবালকে স্মরণ করিয়ে দেয় না কিভাবে সে বেঁচে আছে। শৈবালের এই মনোভাব যেমন হাস্যকর তেমনি মানসিক নীচতা ও দীনতার পরিচায়ক।

এ-জগতের মানুষের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে, সবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা সমান নয়। কেউ বিরাট রাজ্যের অধিপতি, আবার কেউ সেই অধিপতির অধীনে সামান্য প্রজামাত্র। অধীনের সামর্থ্য অনেক সময় এত ক্ষীণ থাকে যে, তা দিয়ে বড় কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তারা ছোট কোন কাজ সম্পন্ন করে তাদের প্রভুকে বলে যে, আমি এই কাজটুকু আপনার জন্য করেছি স্মরণ রাখবেন, তবে তা হবে ঐ দিঘিকে শৈবালের শিশিরের জল প্রদানের মতোই হাস্যকর ও নীচতার পরিচায়ক। কেননা, যারা মহান তারা কখনোই অন্যকে উপকারের কথা বলেন না। তারা প্রতিনিয়ত নীরবে আত্মদান করে মানুষের উপকার করে যান; নিঃস্ব মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তারাই পৃথিবীর স্মরণীয়-বরণীয় মানুষ, মানবতার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হন। কিন্তু সামান্য, তুচ্ছ, যার দান করার কোন ক্ষমতাও নেই, সে সামান্য উপকার করে যদি তা স্মরণ রাখতে বলে তখন নিঃসন্দেহে তাকে ছোট মনের মানুষ বলাই যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যত মহামানব আছেন, তাঁরা বিশ্বমানবতার জন্য অক্লান্ত কাজই করেছেন। কখনো তা নিয়ে নিজে অহংকার করেননি।

আত্ম-অহংকার, দাম্ভিকতা করা উচিত নয়। কাউকে সামান্য দান করে তা বারবার বলার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। তা সভ্য সমাজে শুধু কৌতুক বলেই মনে হবে। কেননা যারা তিল তিল করে সাধারণ মানুষের জন্যই এই বিশ্ব সভ্যতা সৃস্টি করেছেন, তারা কখনই তা বলেন না। তাই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে শৈবালের মতো ক্ষুদ্রমনা চিন্তা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

ষড় রিপুর মধ্যে লোভ ভয়াবহতম রিপু। এটি মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অনেক সময় অযাচিত চাহিদার বশবর্তী হয়ে, মানুষ তার কামনা-বাসনাকে পূরণ করার জন্য, নানা লোভের মোহে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। আর তখনই সে অনবির্যভাবে পাপের পথে এগিয়ে যায়। লোভ আর পাপের যৌথ প্রযোজনায় তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মানুষ আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঁচে। কিন্তু সেই আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামর্থ্য ও বাস্তবের মিল থাকতে হয়; সঙ্গে থাকতে হয় সাধনা-সংগ্রাম করার মানসিকতা। কিন্তু যখনই কারো আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামর্থ্য ও বাস্তবের মিল থাকে না, সংগ্রাম আর সাধনার যোগ থাকে না, তখন তা আর স্বপ্ন থাকে না। তখন তাকে বলা হয় লোভ। লোভ মানুষকে কষ্ট করে কোন কিছু অর্জন করা থেকে বিরত রাখে। সামর্থ্য, বাস্তবতা আর সাধনার বাইরে গিয়ে অতি আশা বা লোভ মানুষকে অমানুষ করে তোলে। সে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারায়। কেননা, আমরা সেই গল্পটি জানি, সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে কিভাবে দরিদ্র ব্যক্তিটি এক সাথে সব ডিম পাওয়ার জন্য হত্যা করে। কিন্তু পরে দেখা গেল কোন ডিম তাতে নেই। এ-লোভ তার সমস্ত স্বপ্নকে যেমন হত্যা করেছে, তেমনি তাকে পাপের দিকেও ঠেলে দিয়েছে। একই সঙ্গে ঐ লোভী ব্যক্তির মনুষ্যত্বের হয়েছে অপমৃত্যু। তার দৈহিক মৃত্যু না হলেও আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। আবার গল্পের সেই চরিত্রের কথা কে না জানে, যে-ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে সূর্যাস্তের আগে বিশাল ভূ-খণ্ড বৃত্তাকারে ঘুরে আসতে গিয়ে বৃত্তটাই পূরণ করতে পারল না। বৃত্ত পূরণ করার আগেই মরে গেল। অতি লোভই তার মৃত্যুর কারণ হল। লোভের বশবর্তী মানুষকে জীবন-সংসারে খেতে হয় অসংখ্য হোঁচট। তার জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। লোভের চোরাবালিতে একবার পা দিলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। লোভ ডেকে আনে ধ্বংস, আর ধ্বংসই এক প্রকার মৃত্যু। এজন্য বলা হয়– 'সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনি যে লোভে বন্দি নয়।' ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মীর জাফর অতি লোভ করে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণে ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই মসনদের সুখ-সমৃদ্ধি সসম্মানে ভোগ করতে পারেননি। তার অসম্মানজনক পরিণতি হয়েছে। এভাবে অনেকে লোভের মোহে বুদ হয়ে নানা রকম পাপাচার করে ধ্বংস হয়েছে।

লোভের বশবর্তী হয়ে পাপাচার করে মানুষের সব সময় দৈহিক মৃত্যু না হলেও, আত্মার মৃত্যু ঘটে যায়। আত্মিক মৃত্যু দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। কেননা মানুষ বাঁচে তার আত্মার সতেজতার মাধ্যমে।

দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়

একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে ঐ জাতির নৈতিক আদর্শের ওপর। যে-জাতি চেতনায় সুনীতিকে যত বেশি লালন করে এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটায়, সে-জাতির উন্নতি তত দ্রচতগামী হয়। আর যে-জাতি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বকে ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় নেয় সে-জাতির সামগ্রিক উন্নতি সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে।

কোন আদর্শের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা ব্যবহারিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিই দুর্নীতি। অবৈধভাবে সম্পত্তির আত্মসাৎ অথবা সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। যারা এ-ধরনের নৈতিকতা বা আদর্শ-বর্জিত মানুষ তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য চরমভাবে ক্ষতিকর। তাদের কারণে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি চরমভাবে ব্যাহত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির দেশ ও জাতি নেই। তারা কেবল নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এভাবে একটি দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভালাভের দিক বিবেচনা করে কাজ করে তবে, সেই দেশের সার্বিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। সার্বিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হলে জাতি হয়ে পড়ে দুর্বল। জাতীয় জীবন থমকে যায়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Opportunity makes a man thief. একজন ব্যক্তি নিজ মেধা গুণে উচ্চ আসনে আসীন হতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সুযোগকে অসৎভাবে ব্যবহার করে নানা রকম দুর্নীতি করে থাকেন, তবে তিনি ঐ জাতির জন্য অভিশাপ। তিনি চোর বলে সাব্যস্ত হবেন। আর কোন ব্যক্তি সুযোগ পেয়েও যদি ন্যায়-নিষ্ঠভাবে নিজের কাজটি যথাযথভাবে পালন করেন তবে তার দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। তিনি রাষ্ট্রের উন্নয়নের একজন ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেন। দুর্নীতি জাতীয় জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনে এক চরম অভিশাপ। দুর্নীতি সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি কেড়ে নিয়ে

যায়। মানুষ হয়ে পড়ে অসহায়। কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে, কেউ গরিব থেকে আরো গরিব হতে থাকে। সৃষ্টি হয় বৈষম্যের সংস্কৃতি। আর সামগ্রিক সুখ-সমৃদ্ধি উন্নয়ন যা-ই বলি না কেন তা হয় সুদূর পরাহত।

দুর্নীতি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটি পরিচিত ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রকোপ একটু বেশি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ-শাসন-দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেশ স্বাধীন করেছিলেন বাংলার আপামর জনগণ। কিন্তু সেই দুর্নীতির ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি। এই জন্য আমাদের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন। নৈতিকভাবে সুদৃঢ় হলে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন

মানুষের জীবনকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সোপান হল জ্ঞান। আর বেঁচে থাকার জন্য, পার্থিব সুখ শান্তির জন্য প্রয়োজন ধন সম্পত্তি। কিন্তু তা কেবল অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে কাজে আসবে না। তাকে প্রচলিত প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনের সময় প্রায়োগিক করতে হবে। তা না হলে ঐ জ্ঞান এবং ধন-সম্পত্তি অর্জন দুটোই বৃথা হবে।

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য জ্ঞান অর্জন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি ধন-সম্পত্তি অর্জনও প্রয়োজনীয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষকে সর্বোচ্চ মুল্য দিতে হয়, সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে হয়। তারপর আসে সেই কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান নামক সোনার হরিণ। কিন্তু কেউ যদি শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যে থেকে হরবোলা পাখির মতো পড়াগুলো শুধু মুখস্থই করে, তবে তা কোন কাজে আসবে না। গ্রন্থের বিদ্যা বা জ্ঞান নির্জীব। তাকে আত্মস্থ করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে সজীব ও অর্থবহ করে তুলতে হয়। গ্রন্থের বিদ্যাকে ব্যবহার করে ভেতরের নানা সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হয়; মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়। গ্রন্থ থেকে অর্জিত বিদ্যাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যার সোনার কাঠির স্পর্শে যে-মানুষের অন্তর্জগৎ জেগে উঠল না, যে-মানুষের ভেতরটা আলোকিত হল না, তার বিদ্যা অর্থহীন। ঠিক ধন-সম্পত্তির বিষয়টিও একই রকম। ধন-সম্পদের বড় গুণের একটি হচ্ছে তা প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ সাধন করতে পারে। কিন্তু সেই ধন-সম্পদ যদি কেউ এক জায়গায় কুক্ষিগত করে রাখে, নিজের ও দশের কল্যাণে ব্যবহার না কওে, তবে তার কোন মূল্যই থাকে না।

বিদ্যা এবং ধন দুটিই নির্জীব জড়। তাকে মানুষই সজীব, চলিষ্ণু, অর্থবহ, কল্যাণময় করে তোলে এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে। নিজের এবং সভ্যতার বিকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেই শুধু বোঝা যায় যে, বিদ্যা আর ধন উভয়ই ফুলের মত সুরভিময়। ব্যক্তি ও তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়াতেই তার বিকাশ। জ্ঞান যেমন বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, তেমনি ধনও শুধু সঞ্চিত করে রাখার বিষয় নয়। তা প্রয়োজনে ব্যবহারের মধ্যেই সার্থকতা।

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

বিচার কোনো অমানবিক বিষয় নয়। মানুষ মাত্রই অপরাধপ্রবণ– এটা যেমন সত্য, তেমনি মানুষই মানবিক হতে পারে– এটাও একইভাবে সত্য। বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করতে যান, তখন তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ, আইনানুগ এবং একই সঙ্গে মানবিক। বিচারের সাথে যদি বিচারকের ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা জড়িয়ে থাকে তবে তা বিচারের যথাযথ মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে। নিরপেক্ষ বিচারের সাথে যদি মানবিক বিষয়টির রসায়ন ঘটে তবেই সে বিচার হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ।

এই সভ্য সমাজে মানুষের মধ্যে যেমন সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে, তেমনি এই মানুষই জড়িয়ে পড়ছে নানামুখী অপরাধের সাথে। এসব অপরাধীদের জন্য রয়েছে বিচার ব্যবস্থা। বিচারের মাধ্যমেই অপরাধী পায় যথাযথ শাস্তি, নিরপরাধ পায় মুক্তি এবং সমাজে ফিরে আসে শান্তি। আর এই বিচারের কাজটি করে থাকে বিচারক। অপরাধীর বিচার করতে গিয়ে বিচারককে হতে হয় ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, নিরপেক্ষ। কিন্তু একই সঙ্গে বিচারককে হতে হবে মানবিক। মানবিক হতে হবে মানে এই নয় যে, দয়া পরবশ হয়ে অপরাধীর শাস্তিযোগ্য অপরাধকে ক্ষমা করে দেবেন। অপরাধের শাস্তি অবশ্যই তিনি অপরাধীকে

দেবেন। কিন্তু অপরাধীর প্রাপ্ত শাস্তি অপরাধীকে যতটা ব্যথিত করে, সেই ব্যাথা বিচারককেও অনুধাবন করতে হবে। বিচারক নিজেকে দণ্ডিতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করলে তবেই তা শ্রেষ্ঠ বিচার হবে। কিন্তু যদি কোন বিচারক একান্ত পেশাদারিত্বের খাতিরে শুধু বিচারকার্য সম্পন্ন করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দেন, তবে সে বিচার হয়ে যাবে অমানবিক। এটি একজন বিচারকের কাছ থেকে কাম্য নয়। কেননা যে-ব্যক্তি অপরাধ করেছে, সেও সমাজেরই আলো-বাতাস, স্নেহ-মমতায় বেড়ে ওঠা একজন মানুষ। যদি বিচারক ঐ দণ্ডিতের মানবিক দিক লক্ষ রেখে শাস্তির বিধান করেন তবে দণ্ডিতের মধ্যেও পরবর্তীতে ভাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। এখানেই একজন বিচারকের কৃতিত্ব। । তবে অবশ্যই তা হতে হবে নিরপেক্ষ এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে।

তাই ব্যক্তি-জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে, এই আদর্শকে ব্রত করে আমরা যদি চলতে পারি, তবে সমাজ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক সমাজ।

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসঙ্গে বাঁধা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা

কোনো মানুষের পক্ষে বিশ্রামহীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। বিশ্রামহীন কাজ মানুষকে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম মানুষকে আবার কাজ বা পরিশ্রম করার জন্য তৈরি করে তোলে। কাজ এবং বিশ্রাম পরস্পরের পরিপূরক।

প্রাণের অস্তিত্ব, পরিশ্রম আর বিশ্রাম পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। প্রাণের পূর্ণতা সাধিত হয় পরিশ্রম এবং বিশ্রামের এক অসামান্য সামঞ্জস্যে। বিশ্রাম কাজেরই একটি অঙ্গ। বলা যায় প্রধানতম অঙ্গ। চোখ যেমন অনবরত দেখার কাজ করে, তেমনি চোখের পলক তার দেখার শক্তি জোগায়। দিন যেমন মানুষকে কর্মব্যস্ত রাখে রাত তেমনি ঘুমের মাধ্যমে মানুষকে আবার পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। চোখ ও চোখের পলকের যে-সম্পর্ক, রাত ও দিনের যে-সম্পর্ক, আলো ও অন্ধকারের যে-সম্পর্ক, বিশ্রাম ও কাজেরও সেই সম্পর্ক। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থপূর্ণ তো নয়-ই, বরং একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন কাজ জীবনে নিয়ে আসে একঘেয়েমি, জড়তা, নীরস প্রাণের অস্তিত্ব। কিন্তু এই কর্মের মধ্যে সামান্য বিরতি সমস্ত ক্লান্তিকে দূরীভূত করে যেন আবার নতুন করে কাজে উদ্যম নিয়ে আসে। যেখানে শুধু কাজ আর কাজ, বিশ্রাম গৌণ, সেখানে সোনা ফললেও সে-সোনার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সেই জন্য কর্মের সাথে চাই কর্মের বিরতি। কেননা মানুষ যন্ত্র নয়, সে জন্য বলা হয়– Man is not machine. মানুষ যেহেতু যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে না, তাই তার এই ধূসর কর্মময় জীবনে বিশ্রাম নিয়ে আসে নতুন করে কর্মের নতুন স্পৃহা। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এটি ধ্রুব সত্য। নির্দিষ্ট কর্ম ঘণ্টার পর মানুষ তার বিশ্রামের জন্য সময় চেয়েছে। মহান 'মে দিবস' এ-কথারই যেন সুর তোলে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তার বিশ্রামের জন্য সুযোগ থাকতে হবে। যাতে নতুন প্রাণের উন্মাদনায় আবার কাজ শুরু করতে পারে।

বিশ্রামহীন পৃথিবী কল্পনাই করা যায় না। কাজ এবং বিশ্রামের সুষম বণ্টনই যেন সোনা ফলানোর ছন্দ। সেই ছন্দের গতিতে পৃথিবী খুঁজে পায় নতুন প্রাণ।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

অন্যায় করা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকা দুটিই ঘৃণার। অন্যায় করা যেমন খারাপ, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে আরো অন্যায়ের জন্মকে ত্বরান্বিত করাও খারাপ।

সমাজ মানেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সমষ্টি। মন্দ ও অন্যায় আছে বলেই সুন্দর-স্বাভাবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ গড়ে তোলে আইন-কানুন। চিহ্নিত করে দেয় কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়। একটি সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা কোন অনুশাসন মানে না, অন্যায়, অবিচার, উৎপড়ীন নানামুখী খারাপ কাজ করে থাকে। ফলে সমাজে তৈরি হয় অশান্তি ও দুরাচার। এসব কাজ নিন্দনীয়। কিন্তু সমাজে দেখা যায় অনেক মানুষ তা দেখেও না দেখার ভান করে। নীরবে

এসব অন্যায় সহ্য করে। নিজেদের বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে প্রতিবাদী হয় না। এটি এক প্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। অন্যায়কে আরো বাড়তে দেওয়ার, বাধামুক্ত করে দেওয়ারই নামান্তর। এতে সমাজে অন্যায়ের প্রতাপ বাড়ে, অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম হয়। ন্যায়ের নির্বাসন ঘটে। ফলে এক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত যেখানে অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ করা। অন্যায়ের টুটি চেপে ধরে এর বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া। যদি কেউ তা না করে তবে সেও অন্যায়কারীর মতই ঘৃণার্হ্য। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা আত্ম-সুখকাতর, আত্মকেন্দ্রিক এবং বিলাসী। তাদের সামনের ওপর দিয়ে কেউ অন্যায় করলে তারা কিছু বলে না। এর ফলে অন্যায়কারীরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এতে কিন্তু ঐ ব্যক্তিই প্রকারান্তরে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন– সমাজে ঘুষ নেওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু যারা দিচ্ছেন এবং নীরবে সহ্য করছেন তারা যদি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন তবে হয়ত বা ঘুষ নেওয়া অনেকাংশে কমে যাবে। আর যদি ঘুষ দিয়ে যান বা নীরবে সহ্য করে যান তবে দুর্নীতি আরো বৃদ্ধি পাবে। দুজনই সমান অপরাধী হয়ে উঠবেন। অন্যায়কারীকে যদি কোন প্রকার বাঁধা না দেয়া হয়, তবে সমাজে অন্যায় ব্যাধির মতো মহামারি আকার ধারণ করবে। এজন্য প্রয়োজন মেরুদণ্ড শক্ত করে অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কেননা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্যায়কে প্রতিবাদ করার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান সমাজে অন্যায় সহ্য করায় সামাজিক অস্থিরতা বেড়েই চলেছে এবং অপরাধীদের প্রতিবাদ না করায় তারা একের পর এক অপরাধ করেই যাচ্ছে। এ-অবস্থায় প্রতিবাদ না করে আমরা মূলত নিজেরাই অপরাধী হয়ে উঠছি।

এমতাবস্থায় আমাদের সকলের উচিত অন্যায়কে ঘৃণা করা এবং তার প্রতিবাদ করা। তবেই সুখী সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য কঠিন কিছু হবে না।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

জীবনে উন্নতির জন্য, কাঙ্ক্ষিত যে-কোনো কিছু অর্জনের জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব।

'পরিশ্রম' অর্থ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করা। আর 'প্রসূতি' অর্থ জন্মদাত্রী। একটি কারণ এবং অন্যটি ফলাফল। যে-ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে-ই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। কারণ, পরিশ্রম তথা নিরলস সাধনার মধ্যেই সৌভাগ্যের বসবাস। সৌভাগ্য বাইরে থেকে আসে না। কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেই তার সৌভাগ্যকে নির্মাণ করতে পারে। কাজ না করে, যে-মানুষ কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, সে তার স্বপ্নকে সফল করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া কৃষকের ঘরে ফসল আসবে ভাবা যায়?

পরিশ্রমের বিপরীত ভাগ্যে বিশ্বাস করা; নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করা। এর মানে অলস জীবন যাপন করা। শুধু ভাগ্যে বিশ্বাস করে, নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, অলস জীবন যাপন করে কোনো কিছু লাভ করা যায়– এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। নিজে কোনো কিছু লাভ করতে হলে, মানুষের জন্য কিছু করতে হলে, মৃত্যুর পর পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। কথায় বলে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। অলস মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি মানব জাতির বোঝা; অগ্রগতির অন্তরায়। পৃথিবীতে যাঁরা অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করে মহৎ হয়েছেন, মহামানব হয়েছেন, তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁদের সমগ্র জীবন কর্মমুখর, ঘর্মাক্ত। এজন্য সব ধর্ম এবং মহামানব পরিশ্রম তথা কাজ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিশ্রমীর হাত সবচেয়ে পবিত্র হাত এবং সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয় হাত। আধুনিক উন্নত পাশ্চাত্য দুনিয়ায় কাজকে, পরিশ্রম করাকে ধর্মচর্চার অংশ মনে করা হয়।

জীবনে উন্নতির জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পরিশ্রমহীন ভাগ্য-নির্ভরতা দেশ, জাতি, মানুষ, পৃথিবীকে পিছিয়ে দেয়। ভালো কিছু লাভ করার জন্য দরকার উপযুক্ত পরিশ্রম।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। যে-কোন জাতির পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, সেই জাতির শিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অশিক্ষিত মানুষ একটি জাতির অগ্রগতির পথে শুধু বাধা নয়, বোঝাও বটে। যে-জাতির জনগোষ্ঠী যত শিক্ষিত সে- জাতি ততো দ্রচত উন্নতি করে। এজন্য বলা হয়, যে-জাতি জ্ঞানে বড় নয়, সে-জাতি ধনে বড় নয়। কোন জাতি কতটা সভ্য তার প্রধান নির্ণায়কও এই শিক্ষা। শিক্ষা না থাকলে একটি জাতির অর্থনীতি, সংস্কৃতিও অনুন্নত হতে বাধ্য। শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের আলো। এই আলো যে-জাতির মধ্যে ঢুকেছে, সে-জাতির সর্বত্র আলোকিত হয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ– বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের– দেশগুলো এক সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ ছিল। ওই দেশগুলো ততোদিন পর্যন্ত শাসন ও শোষণের শিকার ছিল, যতদিন পর্যন্ত ওই জাতিগুলো যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি। অশিক্ষার ফল স্বরূপ তারা পরাধীন ছিল। অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন ছিল। কিন্তু ওই জাতিগুলো যখন শিক্ষিত হয়েছে, তখন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষার কারণে পরাধীন জাতিগুলো স্বাধীন হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা একটি জাতিকে তার ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এ-কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে নানা মুনি নানা মত রাখলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব সময় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, বাঙালি তথা ভারতবর্ষের মানুষ ভেতরগতভাবে শিক্ষিত হলে, তাদের বাইরের পরাধীনতা ঘুচতে বাধ্য। শিক্ষা একটি জাতিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও স্বপ্নবান করে তোলে। ফলে সে-জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

শিক্ষা যে একটি জাতির মেরুদণ্ড তার প্রমাণ ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী নিধনের ঘটনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে এদেশের শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে হত্যা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়া। যাতে করে বাঙালি জাতি অদূর ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ-জন্য বলা হয়– যদি কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে সেই জাতির শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকের মাথা কাট। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড।

শিক্ষা একটি জাতির মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করে। মানুষকে সম্পদে পরিণত করা ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা অসম্ভব। এজন্য শিক্ষা যে-কোনো জাতির উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই

শারীরিকভাবে মানুষ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু মানুষের কীর্তি বা মহৎ কর্ম টিকে থাকে। মহৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে।

মানুষের জীবন পৃথিবীতে খুবই সংক্ষিপ্ত। এটি জানার পরেও সব মানুষই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু তা অসম্ভব। পৃথিবী থেকে মানুষকে বিদায় নিতেই হয়। অধিকাংশ মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবী এবং মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। কিন্তু যেসব মানুষ পৃথিবীতে মহৎ কর্মের মাধ্যমে দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মারা যায়, পৃথিবীতে তাদের স্মৃতি টিকে থাকে। মানুষ তার রেখে যাওয়া সৃষ্টিকর্ম, মহৎ-কর্ম তথা কীর্তির মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ কীর্তিমান মানুষ মরেও অমরতা লাভ করেন। ভাবা যাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আজ থেকে প্রায় পৌনে এক শতাব্দী আগে। কিন্তু বাঙালি জাতির সংকটে-সমস্যায়, উৎসবে-আনন্দে, একান্ত অনুভবে তিনি তো প্রতিনিয়তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছেন। শারীরিক অস্তিত্ব না থাকলেও কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত যেন আমাদের সঙ্গ দিয়ে চলেছেন। সৃষ্টিশীল মানুষ, কীর্তিমান মানুষ না থেকেও এভাবেই থাকেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে।

প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্য এখানেই যে, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ শরীর সর্বস্ব নয়। অন্যান্য প্রাণী মারা গেলে; তার শারীরিক অস্তিত্ব লোপ পেলেই, সে শেষ হয়ে যায়। কারণ তার কোনো কীর্তির স্বাক্ষর সে পৃথিবীতে রেখে যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। মানুষের সেই সক্ষমতা, ইচ্ছা, আকুলতা থাকে বলেই সে মানুষ। পৃথিবীতে যে-মানুষ মহৎ-কর্ম বা কীর্তির স্বাক্ষর রাখতে পারে না, সে ব্যর্থ মানুষ। মানুষ ব্যর্থ হতে চায় না। পৃথিবীতে কীর্তিও মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। এভাবেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে ওঠে।

সারা জীবনব্যাপী ভোগ এবং তারপর একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া, যথার্থ মানুষের পরিচায়ক নয়। আমাদের উচিত যার যার সাধ্য মতো পৃথিবীতে এমন কিছু করে যাওয়া, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও মানুষ আমাদের স্মরণ করে।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

স্বাধীনতা অমূল্য ধন। যে-জাতি পরাধীন, সেই জাতিই বোঝে স্বাধীনতা অর্জন করা কত কঠিন। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, তার মর্যাদা সমুন্নত রাখা, আরো কঠিন।

স্বাধীনতাহীনতায় বসবাস করা কোনো জাতির জন্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম বলেই কবি রঙ্গলাল সেন বলেছেন– 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়! দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিতে চায় হে/ কে পরিতে চায়!' 'দাসত্ব শৃঙ্খল' কেউ-ই পরে থাকতে চায় না। এতে একটি জাতির বিকাশ, আত্মসম্মানবোধ, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। এ-কারণে দেখা যায়, পরাধীন যে-কোনো জাতি স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এক সময় হয়ত অনেক জাতি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনই একটি জাতির পরম লক্ষ্য হলে চলে না। স্বাধীনতা অর্জনের পর ওই জাতির কাঁধে চেপে বসে সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার চরম দায়িত্ব। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার সংগ্রাম চিরকালীন। যতদিন একটি জাতি অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত, অর্থবহ করার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে ততোদিন স্বাধীনতা থাকে। নতুবা স্বাধীনতা হারাতে হয় অথবা স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়, স্বধীনতা রক্ষার জন্য বা তাকে অর্থবহ করার জন্য আরো বেশি আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। নতুবা অর্জিত স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর হয়ে যায়। এজন্য খ্যাতনামা মার্কিন ইতিহাসবিদ Hannah Arendt বলেন Freedom means responsibility.

স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে শত্রু থাকে একপক্ষ; যারা পরাধীন করে রাখে শুধু তারা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর শত্রু হয় বহু বিচিত্র। এক্ষেত্রে শুধু অন্য দেশ বা জাতি অর্জিত স্বাধীনতার শত্রু হয় তা নয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, পরনির্ভরশীলতা, অনিরাপত্তা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি স্বাধীনতার শত্রুতে পরিণত হয়। এগুলোকে রোধ করতে না পারলে স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তরই হয়ে যায়। এ-অর্থেও স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা আরো কঠিন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাইরেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দেখি যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা আরো কঠিন। যেমন পরিবার থেকে আমাদের যে-কোনো কিছু করার স্বাধীনতা দিলেই আমরা সব কিছু করতে পারি না, আমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠি না। স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ না করতে পারলে পরিবার থেকে দেয়া স্বাধীনতা আমাদের হারানোর সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করে ভাববিগলিত হয়ে গেলে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলে চলবে না। বরং এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তা ধরে রাখা যে-কোনো জাতির জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে

সুন্দর নাম মানুষের বড়ত্ব বা গুরুত্বের পরিচায়ক নয়, বরং মানুষের মহৎ কর্মই তার বড়ত্বের পরিচায়ক। মানুষ নাম দিয়ে পরিচিত হয় না, মানুষের কাজই তার নামকে পরিচিত করায়।

সুন্দর নাম বা বংশ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর সঙ্গে যাকে আমরা মহত্ব বলি, বড়ত্ব বলি তার কোনো সম্পর্ক নেই। বড় কেউ কাউকে করতে পারে না। মানুষের নিজের মহৎ কাজ দিয়েই তাকে বড় হতে হয়। অসুন্দর নামের অধিকারী হয়েও বা নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও একজন মানুষ তার সাধনা দিয়ে, কর্ম দিয়ে জগতে বড় মানুষের কাতারে শামিল হতে পারে। এ-কারণে কবি বলেছেন– 'নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়,/সেই আশরাফ জগত যাহার পুণ্য কর্মময়।'অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট (আশরাফ) যার 'পুণ্যকর্ম' রয়েছে।পৃথিবীর বহুশ্রুত, মহৎ নামগুলোর মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, তাঁদের নামের মধ্যে শুরুতে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। নামগুলো এতটা সুন্দর বা মহৎও ছিল না। যেমন– আব্রাহাম লিংকন, এ.পি.জে আবদুল কালাম, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা তাঁদের নামকে পৃথিবীর কাছে চিরস্মরণীয় ও অনুকরণীয় করে তুলেছেন। একসময় তাঁদের নাম ছিল অশ্রুত। এখন তাঁদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

মানুষের সম্ভাবনা অসীম। মানুষই পারে তার সীমাবদ্ধতাকে নিরলস সাধনা, পরিশ্রম আর নিষ্ঠার দ্বারা নিজেকে তুলে ধরতে। এই কাজ যাঁরা করতে পারেন, তাদেরই আমরা বলি সফল মানুষ, কীর্তিমান মানুষ। কীর্তিমান ও সফল হওয়ার ক্ষেত্রে নাম বা বংশ পরিচয় মুখ্য নয়, মহৎ কাজই মুখ্য।

ভোগে নয় ত্যাগেই প্রকৃত সুখ

ভোগ করার মধ্যে সর্বসুখ নিহিত বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে করা হয়। কিন্তু সুখের গভীরতা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভোগের সুখ সাময়িক এবং বাহ্যিক। ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব জন্মসূত্রেই মানুষ পায় না। তাকে অর্জন করতে হয় এই শ্রেষ্ঠত্বের জয়মালা। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন কিছু দেখা দেয়, যা তাকে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে দেয়। তেমনি একটি বিষয় ত্যাগ। ত্যাগ ধর্ম মানুষকে মহৎ করেছে। মানুষই একমাত্র জীব, যে ত্যাগে আনন্দ লাভ করে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি যার মধ্যে নেই তার মধ্যে মানুষের অনেকখানিই অনুপস্থিত। ত্যাগে আনন্দ লাভ করার প্রবৃত্তি না থাকলে মানুষ জীবজগতের অন্য প্রাণীদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। জীবজগতের অন্য প্রাণীরা ভোগেই সর্বোচ্চ সুখ লাভ করে থাকে। কিন্তু মানুষ অন্যের জন্যে স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করেই প্রকৃত সুখ লাভ করে। যে-মানুষ শুধু ভোগের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, সে-মানুষের জীবন পশুর জীবন। ত্যাগ হচ্ছে হৃদয়ের খোরাক। এর সুবাস, সুগন্ধ, ঐশ্বর্যই মানুষকে মহৎ করে, প্রকৃত সুখ দান করে। ত্যাগের সুখ প্রকৃত সুখ। প্রস্ফুটিত হওয়া ফুলের প্রাথমিক সার্থকতা। অনেকের জন্যে সুবাস ছড়ানোতে তার চূড়ান্ত সার্থকতা। একইভাবে ভোগের দ্বারা মানুষ যে সুখ লাভ করে তা সুখের স্থূল রূপ। আর অন্যের জন্যে ত্যাগ করার মাধ্যমে যে সুখ লাভ করে তা-ই প্রকৃত সুখ। এটিই মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা। এজন্যে কবি বলেছেন– 'তার মতো সুখ আছে কি কোথাও আপনার কথা ভুলিয়া যাও।' মানুষের প্রধান পরিচয় মনুষ্যত্ববোধে, মানবিকতাবোধে। এই মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ অর্জনের অন্যতম উপায় ত্যাগের মানসিকতা অর্জন। মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে কবি ঠিকই বলেছেন– 'ত্যাগে ধরা দেয়, বিলাসে পালায় এমনি স্বভাব তার।'

মানুষ শুধু তার নিজের পাকস্থলী নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। অন্যের ভাবনাও তাকে ভাবতে হবে। অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগের সুখই পৃথিবীকে এতো সুন্দর করেছে বাসযোগ্য করে তুলেছে।

প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না

সদগুণ, মানবিক অনুভূতি, বিবেক-বিবেচনাই মানুষকে মানুষ কোরে তোলে। এসব গুণই মানুষকে প্রাণিজগত থেকে আলাদা করেছে, দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব।

যার প্রাণ আছে সে-ই প্রাণী। এই হিসেবে মানুষও প্রাণী। কিন্তু প্রাণিজগতের অন্যদের মন নেই বলে তারা প্রাণী হিসেবেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মন বা বিচারবুদ্ধির সক্ষমতার কারণে মানুষ প্রাণিজগত থেকে নিজেকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। মানুষ হয়ে উঠেছে সৃষ্টির সেরা জীব। এজন্য বলা হয় Man is animal with rationality.মন বা বিবেক-বুদ্ধি বা 'Rationality'ছাড়া মানুষ প্রাণী বৈ অন্য কিছু নয়। মানুষকে এই সদগুণটি অর্জন করতে হয়। যে- মানুষের মন যত বড়, উদার, উন্নত সে-মানুষ হিসেবে ততো মহৎ। মনের উপস্থিতির কারণে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, শ্রেয়-অশ্রেয়ের পার্থক্য করে। মনের উপস্থিতিই মানুষকে মহানুভব করে তোলে। পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের মধ্যে মনের উপস্থিতিরই ফল।

মন আছে বলেই মানুষ প্রাণিজগতের অন্য প্রাণীদের মতো শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির পরও তার যেন হয় না। তার প্রয়োজন হয় সৌন্দর্যচর্চার, অন্যের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করার, পৃথিবীকে ফুল-ফসলে ভরিয়ে তোলার। মানুষের এই অতিরিক্ত বাসনাই তার মনের পরিচায়ক। এই মনই মানুষকে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

মন মানে হৃদয়বৃত্তি। মন মানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভের বোধ। মন মানে স্বার্থ-ত্যাগের তাগিদ অনুভব করার সক্ষমতা। এসব আছে বলেই মানুষ প্রাণিজগত থেকে আলাদা। মনহীন মানুষ পশুর সমান।

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

যার যেটা আপন ভুবন, সেখানেই তাকে মানায়; সেখানেই তার সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। আপন পরিবেশ থেকে চ্যুত হলে সব জিনিসই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে সব কিছুরই উদ্ভব, বিকাশ ও প্রকাশের জন্য নিজস্ব নির্ধারিত একটি স্থান আছে। নিজস্ব, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো কিছুকে সরিয়ে নিলে, ওই জিনিসের সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হয়, তেমনি যে পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া হয় সেই পরিবেশের সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে। যেমন, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গাছের ডালেই ফুলকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। ডাল থেকে ফুলকে ঘরে এনে ফুলদানিতে রাখলে ফুলকে যেমন আগের মতো সুন্দর দেখায় না, তেমনি ফুলহীন গাছের সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে। অরণ্য প্রকৃতির খোলা পরিবেশে বিচরণরত হরিণ যতটা সুন্দর, খাঁচায় নিশ্চয় ততোটা নয়। শুধু হরিণ নয়, বনজ পরিবেশে যে-কোনো বন্য প্রাণীকে যতটা সুন্দর দেখায়, অন্য কোথাও তার সেই শোভা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না। আবার বন্য প্রাণীহীন বনের শোভা-সৌন্দর্যও পূর্ণতা পায় না। মায়ের কোলেই শিশুকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

যার যে-স্থান, তাকে সে-স্থানে না রাখলে কেবল তার শোভা-সৌন্দর্যই নষ্ট হয় তা নয়, তার স্বাভাবিক বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, মুক্ত আরণ্যক পরিবেশেই বটগাছের বিরাট প্রকাশ ঘটে। কিন্তু তাকে টবে ঘরের কোনায় রাখলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্র থেকেও বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ফটিক গ্রামের মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা কিশোর। সেখানেই সে সুন্দর। গ্রামীণ পরিবেশেই তাঁর স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছিল। কিন্তু যখনই ফটিককে গ্রামীণ পরিবেশের বৃন্ত থেকে চ্যুত করে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন সে আর বাঁচেনি। ফটিক অকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

সুতরাং স্বাভাবিক শোভা-সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যথাস্থান নীতিই সর্বোত্তম নীতি। যার যার স্থানে তাকে থাকতে দেয়াই শ্রেয়।

দুঃখের মতো এতো বড় পরশ পাথর আর নেই

যে-মানুষের জীবন শুধু সুখময়, সে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। সুখের সঙ্গে দুঃখের স্পর্শই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। দুঃখের স্পর্শ মানুষকে মহৎ ও খাঁটি করে।

পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হয়। দুঃখ মানুষের জীবনে পরশ পাথরের মতো। এর স্পর্শে ক্ষুদ্র মানুষ, সাধারণ মানুষ মহৎ ও অসাধারণ হয়ে ওঠে। যে-মানুষের জীবন সুখময় তার দ্বারা দুঃখী মানুষের বেদনা বোঝা সম্ভব নয়। আর দুঃখী মানুষের দুঃখ বোঝা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষই মহৎ মানুষ হয়নি। এজন্য দেখা যায়, পৃথিবীর সব মহামানবের জীবনই কমবেশি দুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে। জীবনে দুঃখের স্পর্শেই তাঁরা হৃদয়বান হয়েছেন, মহৎ হয়েছেন, স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন। দুঃখের স্পর্শ ছাড়া মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শুধু তাই নয়, দুঃখ হচ্ছে সুখ লাভের একটি ধাপ। এই ধাপ অতিক্রম করেই সুখ লাভ করতে হয়। আর দুঃখ দহনের মধ্যে দিয়ে যে সুখ মানুষ লাভ করে, তার অনুভূতি অনেক গভীর হয়।

দুঃখের স্পর্শ অনুভূতি ছাড়া মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। যে-মানুষের জীবনে ক্ষুধার কষ্ট নেই, সে ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে না। যে-মানুষ পীড়িত হয়নি, সে পীড়িত মানুষের আর্তনাদ অনুভব করতে পারবে না। আর এসব মানবিক অনুভব-অনুভূতি ছাড়া একটা মানুষ মহৎ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, দুঃখের সপর্শে মানুষ তেমনি পবিত্র ও খাঁটি হয়। উন্নত মানুষে পরিণত হওয়ার পরশ পাথর হিসেবে কাজ করে দুঃখ। এ-কারণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন– 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান / তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।'

দুঃখ মানুষকে শক্ত করে, সংগ্রামী করে, যোগ্যতর করে তোলে। যে-কোনো বাধা-বিপত্তি ডিঙানোর সাহস জোগায়। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার প্রেরণা জোগায় দুঃখ। সত্যি দুঃখের মতো এতো বড় পরশ পাথর আর নেই।

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন

মা, মাটি আর স্বদেশ– এই তিনটি বিষয়কে অভিন্ন মনে করা হয়। মাতৃসম স্বদেশের মঙ্গলে যে-ব্যক্তি এগিয়ে আসে না, স্বদেশের বিপন্নতায় যার মন কাঁদে না, সে মানুষ হয়েও পশুর সমান।

মা দুধ, অন্ন, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তার সন্তানকে লালন-পালন করে। সন্তানের বড় হওয়া থেকে শুরু করে তার প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পুরো প্রক্রিয়ায় মায়ের অবদান তুলনাহীন। স্বদেশও মানুষের কাছে মায়ের মতো। প্রতি মানুষ তার স্বদেশের আলো-বাতাস-প্রকৃতি-সম্পদ ভোগ-উপভোগ করেই বড় হয়। মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র তো স্বদেশই। স্বদেশের কাছে মানুষের ঋণের শেষ নেই। মায়ের ঋণ যেমন শোধ করা যায় না, স্বদেশের কাছেও মানুষের ঋণ প্রকৃতপক্ষে অপরিশোধ্য। স্বদেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর সম্পর্কের মতোই। এ-কারণে স্বদেশের বিপন্নতায় মানুষ বিপন্ন বোধ করে। মাতৃভূমি আক্রান্ত হলে মানুষ আক্রান্ত বোধ করে। মায়ের হতশ্রী অবস্থা সন্তানকে উদ্বেলিত করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বদেশের বিপন্নতায়, বিপদে-আপদে যে-মানুষের প্রাণ কাঁদে না, সে পশুর সমান। পশুদের শুধু খাদ্য হলেই চলে। কারো প্রতি তার দায়বদ্ধতা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, ঋণ নেই। কিন্তু মানুষের থাকে। এসব থাকে বইে তো সে মানুষ। এ-কারণে মানুষ যত বড় হয়, মাতৃসম স্বদেশের কল্যাণ নিয়ে, মঙ্গল নিয়ে সে ভাবে। কিভাবে স্বদেশের উন্নতি হবে, সে ভাবনায় মানুষ আত্মনিয়োগ করে। এমন কি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য মানুষ অকাতরে আত্মোৎসর্গও করে। এর প্রমাণ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খলকে নিজের পায়ে পরা শেকল মনে করে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। এজন্য তারা মহান; জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আর স্বদেশের পরাধীনতায় যে কুণ্ঠিত হয় না, লজ্জিত হয় না, তার মুক্তির জন্য প্রাণ নিয়ে এগিয়ে আসে না; সে পশু ছাড়া কী!

তাবৎ পৃথিবীর মহৎ মানুষ স্বদেশের সেবা করে মহৎ হয়েছেন। স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ মহৎ উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয় না। স্বদেশের উপকারে যার হৃদয় মন উদ্বেলিত হয় না, সে শারীরিকভাবে মানুষ হলেও চেতনাগতভাবে সে পশু স্তরেই রয়ে যায়।

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মাতৃভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অন্যভাষা যত সুন্দর, শক্তিশালী ও ভাবপ্রকাশের উপযোগীই হোক না কেন, মাতৃভাষা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করার পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভ করা যায় না।

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। এসব ভাষার কোনোটি অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোনোটি তার নিজস্ব ভাবসম্পদ ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এসব ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাজের কারণে বা জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধির জন্য এসব ভাষা শিক্ষা করা যেতে পারে। অনেকে করেও তাই। কিন্তু তাই বলে অন্য ভাষা মানুষের মনের গভীর, গোপন, একান্ত অনুভূতি প্রকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। অন্যভাষায় ভাবপ্রকাশ হয়ত সম্ভব। কিন্তু একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে, নিজের ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় নিজের মনের ভাবটি যে-পরিমাণ প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বদেশী ভাষা মাধ্যম হলে, প্রকাশ করার সময় নিজেকে নিংড়ে দেয়া যায়। আর লাভ করা যায় সীমাহীন আনন্দ। অন্যভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারার সাধ, আনন্দ কোনোটিই পূর্ণতা পাওয়া অসম্ভব। এদিক লক্ষ রেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাভাষীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনী, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।' মাইকেল মধুসূদন দত্তও ১৩/১৪টি ভাষা জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নিজের মনের গহীন-গোপন অনুভূতি প্রকাশ করতে। কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি এবং যশ কোনোটিই আসেনি। অন্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা করাটাকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের কাছে মনে হয়েছে 'ভিক্ষাবৃত্তি' করার মতো। তাতে মানসিক তৃপ্তি নেই। অবশেষে তিনি বাংলায় সাহিত্যচর্চা করে তৃপ্তি ও খ্যাতি দুই-ই লাভ করলেন। এবং ঠিকই বলে উঠলেন 'মাতৃভাষা-রূপখনি পূর্ণমনিজালে।'

যোগাযোগ-প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক কারণে পুরো পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। নানা কাজের কারণে মানুষকে এখন অন্যভাষাও আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু মনের একান্ত অনুভূতিটি প্রকাশ করে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করার জন্য মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাই আমাদের আত্মপ্রকাশের সর্বোত্তম বাহন।

আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো'
অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

পৃথিবীটা ভালো-মন্দের মিশেলে গড়া। মন্দ না থাকলে ভালোকে ভালোভাবে চেনা এবং উপলব্ধি করা যেত না।

অন্ধকারকে আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত। আমরা সব সময় আলোর মধ্যেই থাকতে চাই। চারপাশ আলোকিত রাখতে ও দেখতে চাই। কিন্তু আলো কী, এর মাহাত্ম্যই বা কী– তা উপলব্ধির জন্য অন্ধকার খুবই জরুরি। অন্ধকার না থাকলে আলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা হয়ত অবগতই থাকতাম না; রাত আর দিনের পার্থক্যই বুঝতে পারতাম না। একইভাবে মন্দ, কালো, ইতর, কুজন, পাহাড়, মরুভূমি ইত্যাদি না থাকলে আমরা ভালো, সাদা, ভদ্র, সুজন, সমতল, সমুদ্রের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারতাম না। পাপ ও পাপী আছে বলেই পুণ্য আর পুণ্যবানের কদর আমরা করতে পারি। পৃথিবীতে শুধু যদি পুণ্য থাকত, পাপ না থাকত, তাহলে পুণ্যবান হওয়ার জন্য মানুষের যে নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রাম, তার আর প্রয়োজন হোতো না। ফলে মানুষের কীর্তির অনেকখানি ঢাকা পড়ে যেত। অমানবিকতার উপস্থিতি এবং বোধ না থাকলে মানুষের মানবিকতার মুল্য থাকত না। মানবিকতার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বোঝা যায় তখনই, যখন তাকে অমাবিকতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মিথ্যা ছাড়া সত্যের মাহাত্ম্য কী! এজন্য কবি বলেছেন– দ্বাররুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি ? সত্য বলে, আমি তবে কোথায় দিয়ে ঢুকি।'

পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষে ইতি আর নেতির মিশেলে গড়া। বৈপরীত্যের মধ্যেই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য ও অগ্রগতি। এজন্য অন্ধকার বা মন্দের নিন্দা করা কোনো কাজের কথা নয়। বরং অন্ধকার বা মন্দকে পাশে রেখে আলোর সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

পৃথিবীতে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্টের অন্ত নেই। দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষকে টিকে থাকতে হয়। আর মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রামের প্রেরণা হচ্ছে আশা। আশা আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে, টিকে থাকে।

মানুষের জীবন ফুলশয্যা নয়। দুঃখরূপী কাঁটার আঘাতে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয় মানুষ। বাস্তব জীবন সত্যিই যেন এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, তরঙ্গ-সংকুল সাগর। মানুষকে এই মত্তসাগর পাড়ি দিতে হয় আমৃত্যু। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই দুঃখের সাগর, সংগ্রামের সাগর পাড়ি দেয়া অসম্ভব হোতো, যদি তার সামনে আশা না থাকত। আশার ভরসা বা আশার হাতছানিই মানুষকে দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত সংসারে সংগ্রাম করতে ও টিকে থাকতে প্রেরণা জোগায়। নতুবা মানুষ দুঃখের কাছে পরাজয় স্বীকার করে থমকে যেত। পৃথিবী, মানুষ ও সভ্যতার অগ্রগতি যেত থেমে।

আশাকে অনেকে 'কুহকিনী' বললেও, প্রকৃতপক্ষে আশাই পৃথিবীর কর্মের চাকাকে সচল রেখেছে। আশা হচ্ছে অজানা সুন্দর, কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। এই কাঙ্ক্ষিত সুন্দরের বাসনা বর্তমানকে সচল রাখে। মানুষ আশায় বুক বাঁধে বলেই তার বিরূপ বর্তমানকে সে জয় করতে পারে। কবি যথার্থই বলেছেন– 'মেঘ দেখে কেউ করিস না ভয় / আড়ালে তার সুর্য হাসে।'

আশা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঝলকানি। আশা সংসারের দুঃখ জয়ের দ্বিজমন্ত্র; তাবৎ পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার, সচলতার প্রেরণা। আশা নেই তো পৃথিবীটা অন্ধকার, স্তব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত।

কতিপয় নমুনাঃ

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

নমুনা : নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা, অন্যায়, অন্যায্যতার আশ্রয় না নিয়ে সত্য, ন্যায় আর ন্যয্যতার পক্ষে থাকার নামই সততা। সততা মানুষকে চেতনাগতভাবে ঐশ্বর্যবান করে তোলে; পবিত্র করে তোলে। সৎ মানুষের জীবন অনাড়ম্বর হতে পারে। কিন্তু তা সুখের জীবন। বিপরীতভাবে অসততার আশ্রয় নিয়ে তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া গেলেও, এটি সকল দুঃখের আকর। অসৎ মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। যে মানুষ সততার পথে থাকে সে-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

যতনে রতন মিলে

নমুনা : পৃথিবীর সভ্যতার গোড়ার কথা যত্ন বা সাধনা। পৃথিবীতে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত জিনিসকে পেতে হলে যত্ন ও সাধনার প্রয়োজন হয়। কথায় বলে, কষ্ট করলে কেস্ট মেলে। যত্ন বা সাধনা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিতকে পাবার একমাত্র সিঁড়ি। যা অযত্নে মেলে তার গুরুত্ব মানুষের কাছে কম। সাধনা ছাড়া যাকিছু পাওয়া যায়, তা রত্নতুল্য নয়। যেকোনো আরাধ্যকে পাওয়ার পূর্ব শর্ত যত্ন, সাধনা, কষ্ট, ত্যাগ।

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান

জ্ঞানই মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই জ্ঞানই মানুষকে পশুজগৎ থেকে আলাদা করেছে। জ্ঞান দিয়েই মানুষ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, পাপ-পুণ্যের পার্থক্য করতে পারে। এই পার্থক্য করার মধ্য দিয়ে মানুষ ভালো, উচিত আর পুণ্যের পক্ষে অবস্থান নেয়। এতে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু পশুর জ্ঞান নেই। সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। সুন্দর অসুন্দরের বোধ তার নেই। একারণে জ্ঞানহীন মানুষ আর পশু ভিন্ন কিছু নয়। একই চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর নাম মাত্র।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

নমুনা : পৃথিবীতে কাঙ্ক্ষিত যেকোনো কিছুকে পেতে হলে বাধা-বিঘ্ন আসতেই পারে। কেউ সেই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিতকে লাভ করতে পারে, কেউ আগেই পরাজিত হয়। এই জয়ী আর পরাজিতের পার্থক্য তৈরি হয় মূলত ইচ্ছা শক্তির তারতম্যের কারণে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে যা চায় তা হাতের মুঠোয় আনবেই। প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তাকে কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার উপায় বাতলে দেবে। আর ইচ্ছাশক্তি যার কম কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কোনো উপায়ই খুঁজে পাবে না। ব্যর্থতার গ্লানিই হবে তার সার।

অর্থই অনর্থের মূল

নমুনা : অর্থ মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, সমাজে মূল্য পেতে হলে অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই অর্থই অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ যখন মানুষকে লোভী আর মূল্যবোধহীন অবিবেচক করে তোলে তখন সেই অর্থ সমাজে, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে নানা অন্যায়, অনাচার আর হানাহানির জন্ম দেয়। বর্তমান পৃথিবীর যত বড় বড় সমস্যা তার মূলে আছে অতিরিক্ত অর্থের লোভ আর অর্থের অপব্যবহার।

দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ

নমুনা : পৃথিবীর সভ্যতার উন্নতির মূলে আছে মানুষের সমবায়ী প্রয়াস। মানুষ একসাথে কাজ করে পৃথিবীকে ফুলে-ফসলে ভরিয়ে তুলেছে। এই পৃথিবী তো এক সময় বসবাসের অযোগ্য ছিল। কেউ একা একক প্রচেষ্টায় পৃথিবীকে নিশ্চয় বাসযোগ্য করে তোলেনি। অনেক মানুষের চেষ্টায় মানুষ জিতেছে বন্য-শ্বাপদের বিপরীতে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর প্রতিটি কাজই যদি অনেকে মিলে একসাথে করা হয় তবে সফলতা আসার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সফল না হলেও তাতে এককভাবে কারো ক্ষতি বা লজ্জা কোনোটিই নেই। কারণ সবাই মিলে চেষ্টা করা হয়েছে। আর একই কাজ যদি কোনো ব্যক্তি একা করে, এবং তাতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যর্থতার গ্লানি তাকে এককভাবে বহন করতে হয়। তাই সবাই মিলে কাজ করাই উত্তম।

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

নমুনা : আমাদের এই পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বড়, ছোট, সাদা, কালো, সুন্দর, অসুন্দর ইত্যাদি নানা রং, রূপ আর গুণের সমন্বয়ে এই পৃথিবী গড়া। সব মিলিয়ে পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য। যে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ তারও পৃথিবীর সৌন্দর্যে-শোভায় পূর্ণতায় অবদান আছে। তাই কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। আপাত তুচ্ছের মধ্যেও থাকে বৃহতের ছায়া, বৃহতের ব্যঞ্জনা। তাই কোনো কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা সমীচীন নয়।

রোম নগরী একদিনে গড়িয়া উঠে নাই

নমুনা : রোম নগরী সমৃদ্ধি, শোভা-সৌন্দর্যের এক চিরায়ত নগরী। কিন্তু এই সমৃদ্ধ রোম, সুন্দর রোম একদিনে তৈরি হয়নি। বহু মানুষের, বহু যুগের, বহু সাধ্য-সাধনার ফলে রোম নগরী গড়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে, আমাদের জীবনে মহৎ কোনো কিছুকে পেতে হলে তা রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিরলস পরিশ্রম, সাধনা, ধৈর্য।

যে সহে সে রহে

নমুনা : মানুষের জীবন নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে মানুষকে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। যে এই প্রতিকূলতা সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না, সে পরাজিত হয়, বিস্মৃত হয়। শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। যে প্রাণী টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে টিকে থাকতে পারেনি, তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই বলা হয়, যে সহ্য করতে পারে, সে-ই পৃথিবীতে টিকে থাকে।

পথ পথিককে সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে

নমুনা : পথ আর পথিক বিষয় দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পথ আগে তৈরি থাকে, পথিক সেই পথ দিয়ে হাঁটে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পথিকই হেঁটে হেঁটে পথ তৈরি করে। পথিক তার প্রয়োজন অনুযায়ী পথের সৃষ্টি করে। এই পথ সৃষ্টি করাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা দিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে। আবার সৃষ্ট পথ বা নতুন আবিষ্কার যখন পুরনো হয়েছে আবার মানুষ সৃষ্টি করেছে নতুন পথ, আবিষ্কার করেছে নতুন কিছু। এটিই মানুষকে মহৎ করেছে।